২

কৌশলের ধারণা
Concepts of Strategy

আলোচিত অধ্যায়ে কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এর মাধ্যমে আমরা কৌশল নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন সম্পর্কে জানতে পারব। কৌশল হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন করা যায়। এটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যদিও এটি সামরিক বাহিনীতে বেশি করে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কালক্রমে এটি ব্যবসায় ও শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ কৌশল হলো অতি পদ্ধতিগত একটি প্রক্রিয়া যার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন করা যায়। কৌশল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সময়, পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে উপযুক্ত কৌশলটি প্রয়োগ করতে হয়। তবে এটি প্রয়োগে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। বিভিন্ন বিষয় বা উপাদান বিবেচনা করে কৌশল নির্বাচন করতে হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : কৌশলের সংজ্ঞা; কৌশলের প্রধান উপাদানসমূহ; কৌশলের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-২.২ : কৌশলের প্রকারভেদ; কৌশল উন্নয়নের পর্যায়; কৌশল নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
পাঠ-২.৩ : কৌশলের ৫-পি; মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের বিভিন্ন উপায় বা পন্থাসমূহ; কৌশলের সীমাবদ্ধতা; কৌশল সফল বাস্তবায়নের সুপারিশ

পাঠ-২.১ কৌশলের সংজ্ঞা; কৌশলের প্রধান উপাদানসমূহ; কৌশলের বৈশিষ্ট্য

Definition of Strategy; Main Elements of Strategy; Characteristics of Strategy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- কৌশলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- কৌশলের উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- কৌশলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- কৌশল গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

কৌশল বা স্ট্র্যাটেজির সংজ্ঞা

Definition of Strategy

কৌশলের ইংরেজী প্রতিশব্দ "Strategy" শব্দটি গ্রিক শব্দ স্ট্র্যাটিজস (Strategos) শব্দ হতে এসেছে যার বাংলা অর্থ হচ্ছে "রণ প্রশাসন"। সামরিক ক্ষেত্রে এটির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। শাব্দিক অর্থে স্ট্র্যাটেজি হলো রণ প্রশাসনের সুকৌশল। বর্তমানে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ কৌশলের বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জনের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনাকে স্ট্র্যাটেজি হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এ সকল প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমূহ মোকাবিলা করে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়াকে কৌশল বা স্ট্র্যাটেজি বলে।

উদ্দেশ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনবোধে পরিকল্পনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করাও কৌশলের আওতাভুক্ত। কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মূখ্য উদ্দেশ্যাবলি ও নীতিমালার সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান কী ধরনের কাজ করবে তার সঠিক চিত্র নিরূপণ করা এবং তার অভিব্যক্তি ঘটানো। নিম্নে কৌশলের কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হলোঃ

***A. B. Chandler**- এর মতে, "কৌশল হলো প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, কর্মপন্থা গ্রহণ এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বণ্টন করা।"*

***William F. Glueck**এর মতে, "কৌশল হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কতগুলো নিয়মকানুন যা সাংগঠনিক আচরণকে প্রভাবিত করে।"*

***G. R. Terry**এর মতে, "জনসাধারণ, প্রতিযোগীগণ, কর্মচারিবৃন্দ ও নির্বাহীবৃন্দের পরিকল্পনা প্রসূত প্রতিক্রিয়া পরিহার কল্পে ন্যূনতম অসুবিধায় পরিকল্পনার ব্যবহার এবং সুচিন্তিত রীতিকে কৌশল বলা হয়।"*

***R. N. Anthony**এর মতে, "প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ, উদ্দেশ্যাবলি পরিবর্তন, উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে ব্যবহৃত সম্পদ এবং এ সব সম্পদের আহরণ, ব্যবহার এবং বিক্রয়ে প্রভাবশালী নীতিসমূহ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে কৌশল নামে অভিহিত করা যায়।"*

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া দক্ষতার সাথে মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থাপনা যে কৌশল অবলম্বন করে, তাকে কৌশল বলে।

কৌশলের প্রধান উপাদানসমূহ

Main Elements of Strategy

কৌশল হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জনের জন্য ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সফলভাবে উদ্দেশ্যার্জন করার দিকে গুরুত্বারোপ করে থাকে। এর চারটি প্রধান উপাদান রয়েছে, যেমন:

১। আগ্রহ (Intent) ;

২। সুযোগ (Opportunity) ;

৩। সম্পদসমূহ বণ্টন (Mobilization resources) এবং
৪। পদ্ধতিগত কর্ম (Systematic action) । নিচে চিত্রের মাধ্যমে উপাদানসমূহ দেখানো হলো :

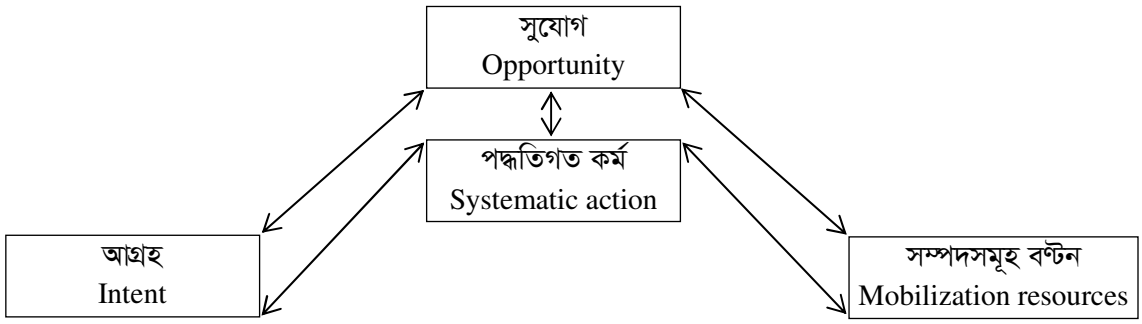

চিত্র : কৌশলের চারটি প্রধান উপাদান।

কৌশলের বৈশিষ্ট্যাবলি

Characteristics of Strategy

স্ট্র্যাটেজি হলো প্রাতিষ্ঠানিক নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের যে সম্ভাব্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে তা মোকাবিলার জন্য পূর্ব নির্ধারিত নীতি বা কৌশল। এরূপ নীতির যে সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **সহযোগী পরিকল্পনা:** স্ট্র্যাটেজি হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়া মোকাবিলা করার কৌশল। মূল কোনো পরিকল্পনা বা নীতি বাস্তবায়নের জন্যই স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা হয়। তাই এটি কোনো ভিন্নতর বিষয় নয় বরং মূল পরিকল্পনার সহযোগী।

২. **পরিস্থিতি নির্ভরতা:** স্ট্র্যাটেজি হলো সব সময়ই পরিস্থিতিনির্ভর। সম্ভাব্য যে সমস্যা মোকাবিলার জন্য এটি প্রণীত হয়েছে বাস্তব অবস্থা তা থেকে কিছুটা ভিন্নতর হতে পারে। তাই পূর্ব নির্ধারিত স্ট্র্যাটেজি হুবহু প্রয়োগ না করে তাকে পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োগ করতে হয়।

৩. **বাস্তবায়নে সতর্কতা:** স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন পড়ে। মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়া সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণের পর উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যথাসময়ে যথাযথ স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ ছাড়া কার্যকর ফল লাভ করা সম্ভব হয় না।

৪. **বিকল্প নির্ধারণ:** কার্যকর স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগে সব সময়ই বিকল্প নিরূপণের প্রয়োজন পড়ে। মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্ভূত পরিস্থিতি ভিন্নতর হতে পারে। তাই কোন্ ধরনের পরিস্থিতিতে কোন্ স্ট্র্যাটেজি ব্যবহৃত হবে তা পূর্ব হতেই নিরূপণ করে রাখতে হয়।

৫. **বৈচিত্রতা:** স্ট্র্যাটেজির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো স্ট্র্যাটেজি আক্রমণমুখী আবার কোনো কোনো স্ট্র্যাটেজি অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন। কখনও এরূপ স্ট্র্যাটেজি প্রতিরক্ষামূলক আবার কখনও তা নীতি বিরোধী মনে হতে পারে।

৬. **পরিবর্তনশীলতা ও আকস্মিকতা:** পরিবর্তনশীলতা স্ট্র্যাটেজির আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ যেহেতু পরিস্থিতি-নির্ভর তাই সর্বশেষ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া স্ট্র্যাটেজি আকস্মিকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যাতে অন্যদের বুঝে উঠার পূর্বেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

৭. **প্রতি আক্রমণের সম্ভাবনা:** স্ট্র্যাটেজি এমন একটি পরিকল্পনা যার মধ্যে অন্যকে পরাভূত করার বা বিজয় অর্জনের বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করে। তাই কোন্ প্রতিষ্ঠান কী স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করছে তা সতর্কতার সাথে প্রতিপক্ষ বুঝতে চেষ্টা

করে এবং সে অনুযায়ী তারাও স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে বিজয় অর্জনের চেষ্টা চালায়। তাই সব সময়ই এক্ষেত্রে প্রতি আক্রমণের একটা সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

a. পরিশেষে বলা যায়, যে স্ট্র্যাটেজি এমন এক ধরনের পরিকল্পনা বা নীতি-কৌশল যা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উর্ধ্বতন নির্বাহী কর্তৃক তৈরি করা হয়। সতর্কতা ও গোপনীয়তা এর সফলতা অর্জনে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই সাধারণ পরিকল্পনা বা নীতি-কৌশল হতে এর স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ :	কৌশলের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উপাদান ও এর গঠন প্রণালী অনুধাবন পূর্বক নিজের ভাষায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

কৌশল হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা অর্জনের জন্য পন্থা বা উপায় নির্ধারণ করা হয়। কৌশলের চারটি প্রধান উপাদান রয়েছে, যেমন- আগ্রহ, সুযোগ, সম্পদের বণ্টন ও পদ্ধতিসম্পন্ন কর্ম। কৌশলের মধ্যে এ চারটি উপাদান থাকতেই হবে। আর সংজ্ঞা থেকে আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাই তা হলো: দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সহযোগী পরিকল্পনা, কার্য পরিকল্পনা এবং এটি উচ্চ পর্যায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত হয়। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্যার্জনে কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

পাঠ-২.২ কৌশলের প্রকারভেদ; কৌশল উন্নয়নের পর্যায়; কৌশল নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

Types of Strategy; The stage of development of strategy; Factors to be considered in Selecting Strategies

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- কৌশলের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কৌশল উন্নয়নের পর্যায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- কৌশল নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কৌশলের প্রকারভেদ

Types of Strategy

প্রতিষ্ঠান ও প্রকৃতিভেদে কৌশল বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। প্রতিষ্ঠান কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং তার লক্ষ্য কী তার উপর এটা নির্ভর করে। যা হোক বর্তমান পরিসরে নিম্নে বিভিন্ন ধরনের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

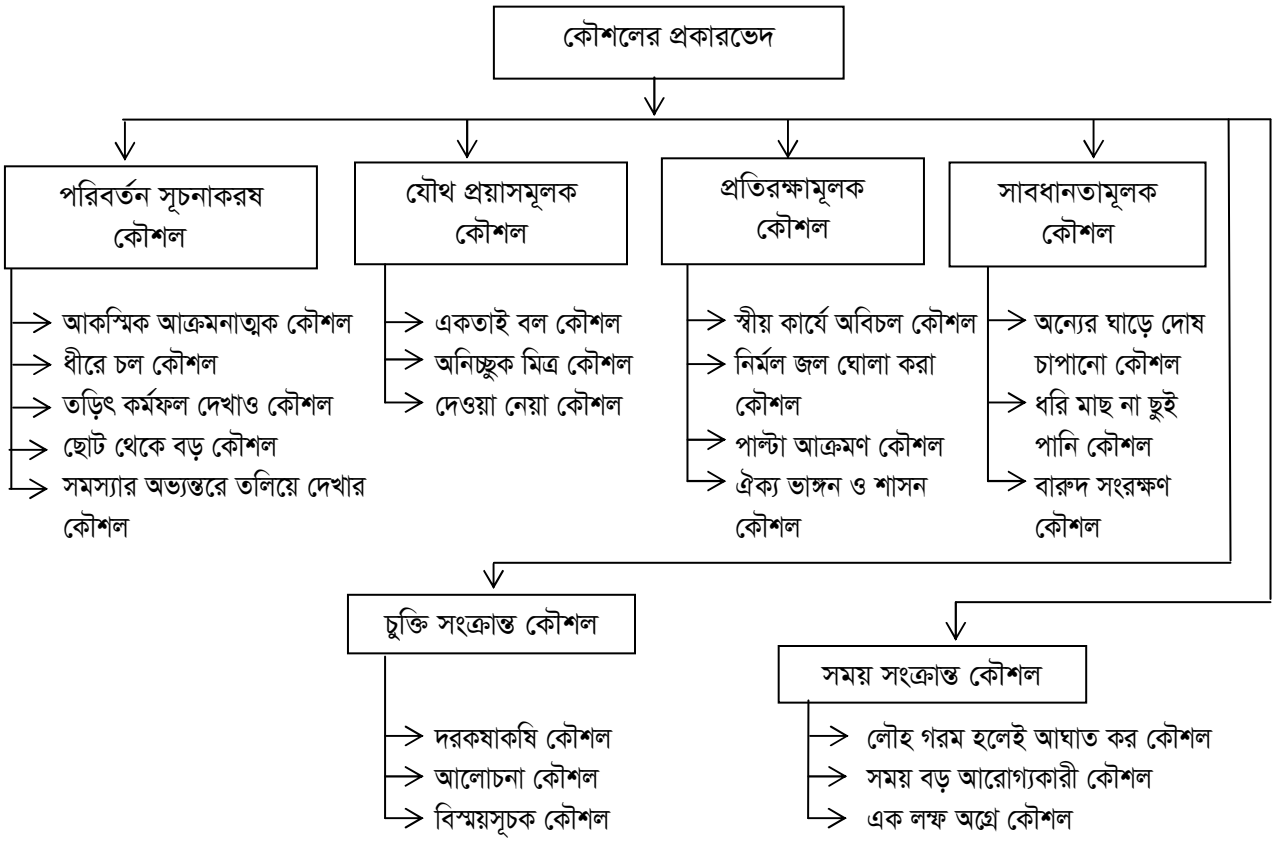

চিত্র : কৌশলের প্রকারভেদ

১। **পরিবর্তন সূচনাকরণ কৌশল:** প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে এ জাতীয় কৌশল গ্রহণ করা হয়। পরিবর্তন সূচনাকরণ কৌশল নিম্নরূপ:

ক) **আকস্মিক আক্রমণাত্মক কৌশল:** এতে হঠাৎ করে পরিবর্তনের সূচনা করা হয়। যেমন- কোনো একজন কর্মচারিকে ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যকর করা উচিত। কারণ আস্তে-ধীরে ছাঁটাই করলে

অন্যান্য কর্মচারীগণ তা জানতে পারে বা তারাও চাকরির নিরাপত্তার অভাববোধ করতে পারে। এতে তাদের মনোবল ও কার্যোদ্যম হ্রাস পেতে পারে।

খ) **'ধীরে চল' কৌশল:** এটা হলো আকস্মিক আক্রমণাত্মক কৌশলের ঠিক বিপরীত। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে কোনো নতুন ধারণা বা পদ্ধতিকে ধীরে ধীরে কার্যকর করা হয়। অর্থাৎ নতুন ধারণা প্রয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হবার পর তা কার্যকর করা হয়।

গ) **তড়িৎ কার্যফল দেখাও কৌশল:** এটি এমন এক ধরনের স্ট্র্যাটেজি যেখানে কোনো নতুন বিষয়ের প্রতি কর্মীদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলে বা পরিবর্তনের ব্যাপারে ভুল ধারণার সৃষ্টি হলে তা দূর করা হয়। সেই সাথে এ বিষয়ে তাদেরকে সুফল প্রত্যক্ষ করানো করা হয়। যেন সকলেই পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। এতে নতুন কোনো বিষয়ের প্রতি সন্দেহ দূরীকরণ ও সুফল প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিবর্তনের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলকে আকৃষ্ট করে তোলা হয়।

ঘ) **ছোট থেকে বড় কৌশল:** এটা হলো একটা পরীক্ষামূলক কৌশল। এতে কোনো বৃহৎ কর্মসূচি বাস্তবায়নের যদি সন্দেহ থাকে বা তার গ্রহণযোগ্যতা না থাকে, তা হলে কর্মসূচির ক্ষুদ্র অংশবিশেষ প্রয়োগ করা হয়। ফল ভালো বা আশাব্যঞ্জক হলে ধীরে ধীরে সার্বিক কর্মসূচি প্রয়োগ করা হয়।

ঙ) **সমস্যার অভ্যন্তরে তলিয়ে দেখার কৌশল:** প্রতিষ্ঠানে যে কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে যা কর্মচারীগণকে হতাশ করে তোলে। এমতাবস্থায়, ব্যবস্থাপককে সমস্যাদির অভ্যন্তরে প্রয়োগ করে তার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক সমাধান বের করতে হয়।

২। **যৌথ প্রয়াসমূলক কৌশল:** এ জাতীয় কৌশলসমূহ দুই বা ততোধিক ব্যবস্থাপক বা নির্বাহী কর্তৃক অনুসৃত হয়। যৌথ প্রয়াস মূলক কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

ক) একতাই বল কৌশল: প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্বাহী নতুন কোনো প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার জন্য অপরাপর নির্বাহীদের নিয়ে জোট গঠন করেন। কারণ 'একতাই বল'-এর শক্তিতে তাদের কৌশল সুফল বয়ে নিয়ে আসে।

খ) **অনিচ্ছুক মিত্র কৌশল:** এ কৌশলের অধীনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে মিত্র বানানোর চেষ্টা করা হয়। যদি কোন ব্যবস্থাপক বা নির্বাহী কোনো অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পন করলে যদি তিনি ঐ দায়িত্ব পালনে উৎসাহী ও তৎপর হন, সেক্ষেত্রে অনিচ্ছুক মিত্র কৌশল কার্যকরী হয়। এভাবে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে মিত্র হিসাবে পাওয়া যায়।

গ) **'দেয়া-নেয়া কৌশল:** এটা ব্যতিহার কৌশল হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে এ ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

৩। **প্রতিরক্ষামূলক-কৌশল:** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কৌশলসমূহ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীগণ নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য এ জাতীয় কৌশল অনুসরণ করে থাকেন। প্রতিরক্ষামূলক কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

ক) **'স্বীয় কার্যে অবিচল'-কৌশল:** এটা হলো নির্বাহী কর্তৃক কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে স্বীয় কার্য চালিয়ে যাওয়ার কৌশল। এতে কোনো দিক হতে সমালোচনা আসলেও নির্বাহী তা এড়িয়ে তার কার্য চালিয়ে যান। কারণ নির্বাহী নিজেই তার কার্যের উপর পূর্ণ আস্থাবান থাকেন।

খ) **নির্মল জল ঘোলা করা কৌশল:** এ ধরনের কৌশলে মূল ঘটনা বা বিষয় হতে মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে আসল বিষয়কে ঘোলাটে করা হয়। এ জাতীয় কৌশল রাজনীতিতে বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেও এর প্রয়োগ লক্ষ্যনীয়।

গ) **পালটা আক্রমণ কৌশল:** প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন ফ্যাশনের দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় সেবা ও কমিশন প্রদান করে থাকে। প্রতিযোগীদের চেয়ে অধিক বিক্রয়ের আশায় এরূপ সেবা, কমিশন ইত্যাদি প্রদানের প্রতিযোগীতাই এ ধরনের কৌশলের জন্ম দেয়।

ঘ) **ঐক্যভাঙ্গন ও শাসন কৌশল:** এটা বিশেষত: রাজনৈতিক কৌশল। তবে এ ধরনের নীতি অবাঞ্চিত বা ক্ষতিকর হলেও তা কারবারী প্রতিষ্ঠানেও প্রয়োগ করা যায়। তবে এতে মারাত্মকভাবে কর্মীদের সহযোগীতা ব্যাহত হয়।

৪। **সাবধানতামূলক কৌশল:** সাবধানতামূলক কৌশলসমূহ প্রয়োগে খুবই কৌশলী ও কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

ক) **অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর কৌশল:** অনেক সময় শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমঝোতা ও মতৈক্যে পৌছতে না পারলে প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট বা তালাবদ্ধ আন্দোলনের ন্যায় অবাঞ্ছিত ঘটনা দেখা দেয়। কিন্তু এর জন্য ব্যবস্থাপনা দায়ী করে শ্রমিকদেরকে, আর শ্রমিকরা দোষ চাপায় ব্যবস্থাপনার উপর।

খ) **ধরি মাছ না ছুঁই পানি কৌশল:** এটা হলো অপরের দ্বারা স্বীয় মতলব কৌশলী উপায়ে হাসিল করিয়ে নেয়া। এ ধরনের কৌশলে কাপুরুষতার লক্ষণ থাকলেও তা আইনসম্মত বলে বিবেচিত।

গ) **বারুদ সংরক্ষণ করা কৌশল:** প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষে যখন তখন ছোট খাট ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত না হয়ে সংকটপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

৫। **চুক্তি সংক্রান্ত কৌশল:** চুক্তি সংক্রান্ত কৌশলসমূহ পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। এ জাতীয় কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

ক) **দরকষাকষি কৌশল:** সাধারণত ক্রয়-বিক্রয় কার্যে এ ধরনের কৌশল ব্যবহৃত হয়। মূলত বিরোধীভাবাপন্ন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে এরূপ নীতি অনুসৃত হয়।

খ) **আলোচনা কৌশল:** এ ধরনের কৌশলে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা করা হয়। এতে আন্তরিকতার অভাব থাকে না। সকলের প্রয়োজন উদ্দেশ্য ও দুর্বলতা ইত্যাদি খোলা মনে প্রকাশ করা হয়।

গ) **বিস্ময় সূচক কৌশল:** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ জাতীয় কৌশল একটু ভিন্ন আঙ্গিকে প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় বিভিন্ন কোম্পানি পত্র-পত্রিকায় '?','!' ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে জনগণকে বিজ্ঞাপনের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়।

৬। **সময় সংক্রান্ত কৌশল:** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সময় অর্থের চেয়েও মহামূল্যবান। তাই সময়কে কাজে লাগানোর জন্য ব্যবস্থাপকগণ নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করেন:

ক) **লোহা গরম হলেই আঘাত কর কৌশল:** এর অর্থ হলো, অবস্থা অনুকূল হলেই দ্রুত কার্যসম্পাদন কর, প্রতিকূল অবস্থায় নয়।

খ) **সময় বড় আরোগ্যকারী কৌশল:** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এমন কিছু কার্য আছে যেগুলো সম্পাদনে একটু বিলম্ব করলে অধিকতর সুফল লাভ করা যায়। কেননা, উত্তেজিত অবস্থায় কোনো বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান সমীচীন নয়। উত্তেজনা প্রশমিত হলে বা কিছু সময় অতিবাহিত হলেই উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান সমীচীন হতে পারে। এতে করে সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায়।

গ) **এক লম্ফ অগ্রে কৌশল:** কখনও কখনও দেখা যায় যে কিছু কিছু বড় কোম্পানি তাদের কর্মচারীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বেতনের বাৎসরিক বর্ধিত হার, বোনাস ইত্যাদি অন্যান্য কোম্পানির পূর্বেই ঘোষণা করে। এ ধরনের কৌশলকে এক লম্ফ অগ্রে কৌশল বলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে কোনো কৌশলই সমান ফলদায়ক নয়। এক একটা কৌশল এক এক সময়ে ও পরিস্থিতিতে ফলদায়ক হয়।

কৌশল উন্নয়নের পর্যায়সমূহ

The stagys of development of strategy

কৌশল উন্নয়নের চারটি পর্যায় রয়েছে যা ১৯৪৫ সাল হতে শুরু হয়েছে। নিচে উক্ত পর্যায়সমূহ তুলে ধরা হলো:

পর্যায়-১ (Stage-1) : ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ১৯৬০ এর শেষ অবধি বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি স্থির ছিল। তবে এটি সম্প্রসারিত অবস্থায় ছিল। অধিকাংশ অর্জনই যুদ্ধের কারণে কম প্রচার পেয়ে ছিল। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে উৎপাদনের পরিমান কম ছিল। এ সময় চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম ছিল। তখন উল্লেখযোগ্য পরিমান চাপা চাহিদা ছিল। প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ছিল সে সকল চাহিদা মোকাবিলা করা।

এ পর্যায়ে কৌশলের ভূমিকা ছিল অর্থনৈতিক সম্পদসমূহকে সচল করা, যেন সরবরাহ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে কৌশলকে প্রাধান্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতো। ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ এর আলাদা শাখা হিসেবে কৌশল (Strategy) আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৫ সালে দুটি বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার একটি হলো- Andrew and Guth কর্তৃক রচিত Business Policy : Text and cose (১৯৬৫) ও অপরটি হলো- Ansoff কর্তৃক রচিত Corporate Strategy (১৯৬৫) । Andrew তাঁর বইতে কৌশল তৈরির মডেল উল্লেখ করেন যা "The basic design model" নামে পরিচিত। নিচে এ মডেলটি দেওয়া হলো :

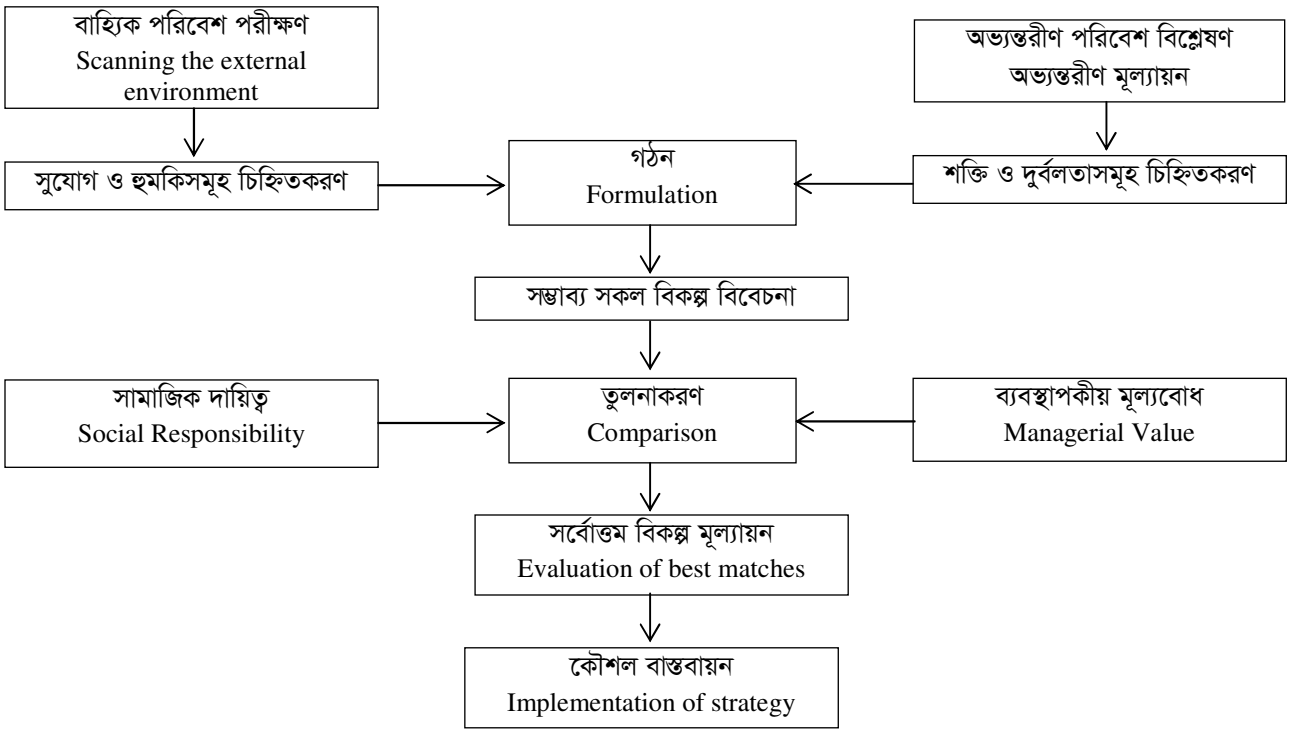

পর্যায়-২ (Stage-2) : ১৯৬০ এর শেষ ভাগ হতে ১৯৭০ এর শেষ ভাগ পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। অধিকাংশ উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ সর্বোত্তম প্রযুক্তি ব্যবহার করতে থাকে। পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির শক্তিসমূহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, তবে তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকে। এ সময় মুনাফা অর্জনের জন্য ভোক্তাদেরকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সবচেয়ে লাভজনক ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে সম্পদসমূহ বিনিয়োগের জন্য কৌশল বিবেচনা করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে কৌশল পরিবর্তন হতে থাকে।

পর্যায়-৩ (Stage-3) : ১৯৭০ এর মাঝামাঝি সময় হতে ১৯৮০ এর মাঝামাঝি সময়কে উন্নয়নশীল বিশ্বে তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও ঋণ সংকটের যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময়ে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায় এবং প্রবৃদ্ধি কমে যায়। স্ট্যাগফেলশনের সময় সামগ্রিভাবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমে যায়। যে কোনো পণ্যের বিপরীতে সম্পদ বন্টনের জন্য কৌশল এর প্রয়োজন হয়। প্রতিযোগীতামূলক সুবিধা বা মুনাফা অর্জন ও বিনিয়োগ তহবিল সৃষ্টির জন্য কৌশল উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল। এ সময় ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কৌশলী ব্যবস্থার প্রয়োগ বৃদ্ধি পায়।

১৯৮০ সালের দিকে Micheal Porter কৌশল উন্নয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য তাত্ত্বিকদের চেয়ে বেশি অবদান রাখেন। তিনি ১৯৮০ সালে Conmpelilive Strategy নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যেখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

পর্যায়-৪ (Stage-4) : চূড়ান্ত পর্যায়-এ আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৮০ সালে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নতুন ও অধিক সংখ্যক জটিল ডাইমেনশন যুক্ত হওয়ায় ব্যবসায়ের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০ সালে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন মুদ্রা সংকোচন বেড়ে যায়। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোম্পানির সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- বেসরকারিকরণ, তুলনামূলক অর্থনৈতিক অবস্থা, দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও সংরক্ষণশীল নতুন পরিবেশে চাহিদার ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য কৌশল প্রয়োজন।
এ সময় হতে ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'কৌশল' এর সফল প্রয়োগ শুরু হয়। ১৯৯০ সালের দিকে এটি আরো নতুনরূপে আবির্ভূত হয়।

কৌশল নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

Factors to be considered in Selecting Strategies

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

১। **প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যাবলি:** কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের প্রকৃতি বিচার-বিবেচনা করতে হয়। উদ্দেশ্যের প্রকৃতি বিচার-বিবেচনায় মূলত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়; যথা– দ্রুত ফল লাভের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐকমত্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা।

(ক) দ্রুত ফল লাভের প্রয়োজনীয়তা: প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের আলোকে জরুরীভিত্তিতে ফল লাভের প্রয়োজন দেখা দিলে 'ধীরে চলার কৌশল' বা 'অকিঞ্চিৎকর' প্রারম্ভের কৌশল গ্রহণ করা যায় না। এই ক্ষেত্রে 'কানে তুলা দেওয়ার কৌশল' বা 'দ্রুত কাজ শেষ করার কৌশল' অনুসরণ করা যেতে পারে।

(খ) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐকমত্য: প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে ঐকমত্য থাকলে 'খোলা মনে আলোচনার কৌশল' গ্রহণ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐকমত্য না থাকলে 'কৈ - এর তেলে কৈ ভাজার কৌশল' বা 'দুর্বল জায়গায় আঘাত হানার কৌশল' গ্রহণ করা যেতে পারে।

(গ) সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা: উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে দীর্ঘকালীন সহযোগিতা প্রয়োজন হলে প্রতি আক্রমণের কৌশল বা 'অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানোর কৌশল' সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না। এই ক্ষেত্রে 'একতাই বল' বা আলোচনা কৌশল অধিকতর ফলপ্রসূ হয়।

২। সমস্যার প্রকৃতি: উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়াস উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রকৃতির উপর কৌশল নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভরশীল। বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে তাৎক্ষণিক, অযৌক্তিক, অনভিপ্রেত এবং স্বাভাবিক রীতিনীতির পরিপন্থী কোনো কার্যসম্পাদন করা অনেক সময় যুক্তিযুক্ত হয়। বিশেষ করে দীর্ঘকালীন সময়ে কোনো স্থানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত থাকলে 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কৌশল' গ্রহণ করা হয়।

৩। অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ চলকসমূহ: প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কার্যসহ অন্যান্য বিষয়ে পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ চলকসমূহ বিচার-বিবেচনা করতে হয়। অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ন্যায় অনাভ্যন্তরীণ পরিবেশও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পার্শবর্তী এলাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বোনাস প্রদান করলে ব্যবস্থাপনাকে স্বীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা করতে হয়। তা না হলে শ্রমিক-শিল্প সম্পর্কে অবনতি ঘটার আশংকা দেখা দেয়।

৪। বস্তুগত ও মানব সম্পদের বর্তমান অবস্থা: কৌশল প্রণয়নে বস্তুগত ও মানব সম্পদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তাদের বিচার-বিশ্লেষণে প্রধানত সম্পদের প্রাপ্যতা, নির্বাহীদের মন-মানসিকতা ও প্রচলিত মূল্যবোধের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো:

(ক) বর্তমান সম্পদ: প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত মাত্রায় পুঁজি ও মানব সম্পদ থাকলে 'দ্রুত কাজ শেষ করার কৌশল' গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যদিকে, উভয়বিধ বা যে কোনো একটি সম্পদ পর্যাপ্ত না থাকলে 'ক্ষমা সংরক্ষণ কৌশল' গ্রহণ করা হয়।

(খ) নির্বাহীদের মন-মানসিকতা: 'ধীরে চলার কৌশল' বা 'প্রতি-আক্রমণ কৌশল' বা 'ঘোলা পানিতে মাছ শিকার কৌশল' বা 'পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কৌশল' ইত্যাদি গ্রহণের বিষয় অনেকাংশে নির্বাহীদের মন মানসিকতা ও তাদের ব্যক্তিগত ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(গ) প্রচলিত ধ্যান-ধারণা: প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রচলিত ধ্যানধারণার উপর কৌশল নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'দরকষাকষির কৌশল' সংশ্লিষ্ট পক্ষ ঘৃণার চোখে দেখে না কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'দরকষাকষির কৌশল' সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট অগ্রহণযোগ্য হয়। অনুরূপভাবে, 'বিভাজন ও শাসনের কৌশল' বিশেষ ক্ষেত্রে সুফলদায়ক হলেও স্তরভেদে বা পরিবেশভেদে তার পরিণতি আশাব্যাঞ্জক হয় না। কারণ, কৌশলের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে প্রচলিত রীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও জনগণের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৫। সাফল্যের সম্ভাব্যতা: প্রতিটি কৌশল নির্ধারণের পূর্বে এর সাফল্য অর্জনের সম্ভাব্যতা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। এই ব্যাপারে প্রধানত দু'টি চলক বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়; যথা- ভবিষ্যৎ পরিবেশ এবং প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

(ক) ভবিষ্যৎ পরিবেশ: কোনো কৌশল গ্রহণের পূর্বে নির্বাহীকে ভবিষ্যৎ পরিবেশের প্রাক্কলন করতে হয়। প্রাক্কলনের যথার্থতার উপর অনেকাংশে কৌশলের সাফল্য নির্ভর করে। ভবিষ্যৎ পরিবেশ অনুকূলে আনয়নের মাত্রার তারতম্য অনুসারে কালক্ষেপণের কৌশল বা 'কানে তুলা দেওয়ার কৌশল' গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(খ) প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া: বিবেচ্য কৌশল গ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্বন্ধে নির্বাহীকে অবহিত হতে হয়। কোনো কৌশল গ্রহণের ফলে অধিকাংশ কর্মী প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলে বা অধিকাংশ কর্মীর দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশংকা থাকলে সেই রকম কৌশল গ্রহণ করা হয় না। অন্যদিকে, প্রস্তাবিত কৌশল বিষয়ে অধিকাংশ ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া অনুকূল হলে তা সহজেই নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

৬। খরচ: কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। ব্যয় বিবেচনার ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয় ছাড়াও অন্যান্য ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করা হয়। কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যয় সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় নিম্নে তাদের উল্লেখ করা হলো:

(ক) বিঘ্নসৃষ্টি: কৌশল নির্ধারণের সময় প্রচলিত সম্পর্ক বা বর্তমান ব্যয় কাঠামোতে যেন অসহনীয় বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে দিকে সর্তক দৃষ্টি দেওয়া হয়। কারণ, অনেক সময় বিশেষ কৌশলের দ্বারা একটি বিশেষ দিকের উন্নয়ন সাধন করা হলেও অন্যান্য দিকে অসহনীয় মাত্রায় প্রতিকূলতা সৃষ্টি হতে পারে।

(খ) প্রণোদনার অপব্যয়: প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীবৃন্দের আনুগত্য ও পণ্যের প্রতি গ্রাহকদের আকর্ষণ প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যে কৌশল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের আনুগত্য বা আকর্ষণ হ্রাস করে, তাকে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেন কর্মীবৃন্দের আনুগত্য হ্রাস তথা প্রণোদনার ক্ষেত্রে অপব্যয় না হয় সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

(গ) অন্যান্য কৌশলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি: কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য কৌশল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার মাত্রা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। কোনো বিশেষ কৌশল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করলে বা বিকল্প কৌশল গ্রহণের পথ রুদ্ধ করলে ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি ও ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষেত্রে প্রবহমান কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার কৌশল বা ধীরে চলার কৌশল অধিক যুক্তিযুক্ত।

(ঘ) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: কৌশল গ্রহণের পূর্বে বিবেচ্য কৌশলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনা করা বিধেয়। কারণ, বিবেচ্য কৌশলের দ্বারা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও উক্ত কৌশলের কারণে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তা ব্যবস্থাপনার সার্বিক লক্ষ্যার্জনে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো প্রতিষ্ঠান তার পরিকল্পনা বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের তথ্য প্রযুক্তি আধুনিকায়নের পক্ষে কম্পিউটার সিস্টেম প্রবর্তনের কৌশল গ্রহণ করে পুরাতন কর্মীর স্থলে নতুন দক্ষ কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সক্ষম হয়। এতে প্রতিষ্ঠানে প্রভুত মাত্রায় অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের ফলে মূল প্রতিষ্ঠানসহ সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে উক্ত কৌশলের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্যার্জনে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আবশ্যক। অন্যথায়, কার্যকরী কৌশল সফলভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ :	কৌশলের প্রকারভেদসমূহ পড়ে প্রতিষ্ঠানে যে সকল কৌশল অনুসরণ করা হয়, সেগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখুন এবং বাস্তবে অনুসরণকৃত কৌশল সমূহের বৈশিষ্ট্যসমূহ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

কৌশল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন: আকস্মিক আক্রমনাত্মক কৌশল, ধীরে চল কৌশল, ছোট থেকে বড় কৌশল, একতাই বল কৌশল, দেওয়া-নেয়া কৌশল, পাল্টা আক্রমন কৌশল ইত্যাদি। কোনো প্রতিষ্ঠান পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে সুবিধাজনক কৌশল গ্রহণ করে থাকে। ব্যবস্থাপকদেরকে কৌশল উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানতে হয়। তা হলে কৌশল প্রণয়নের কাজ সহজ হয়। এতে একটি মডেল দেওয়া আছে, যা অবশ্যই ব্যবস্থাপকদেরকে জানতে হবে।

পাঠ-২.৩ কৌশলের ৫-পি; মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের বিভিন্ন উপায় বা পন্থাসমূহ; কৌশল বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা, কৌশলের সফল বাস্তবায়নের সুপারিশ

5 Ps of Strategy; Approaches to HRM Strategies; Limitations of Applying or Implementing Strategy; Recommendation for Effective Implementation of Strategy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- কৌশলের ৫-পি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের বিভিন্ন উপায় বা পন্থাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- কৌশলের সীমাবদ্ধতাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কৌশলের সফল বাস্তবায়নের সুপারিশ বর্ণনা করতে পারবেন।

কৌশলের ৫-পি

5 ps of Strategy

কৌশল হলো একটি প্রক্রিয়া যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে, যেন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাবলীলভাবে অর্জিত হয়। যাই হোক, Mintzberg কৌশলের ৫-টি 'পি' ধারণার উন্নয়ন সাধন করেছেন, যা কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এগুলো নিম্নরূপ-

১। **পরিকল্পনা (Plan) :** ভবিষ্যতে কী করা হবে তার অগ্রীম সিদ্ধান্তই হচ্ছে পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত কর্মপন্থা, যা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কার্যসম্পাদনের জন্য নির্বাচন করা হয়।

২। **উদ্দেশ্য (Purpose) :** উদ্দেশ্য হলো কতকগুলো সমপর্যায়ের কার্যের সমষ্টি কখনো যা পরিকল্পনার ফল আবার কখনো পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে জরুরী কার্যের প্রতিক্রিয়ার ফল। এভাবে উদ্দেশ্য ধারণার পরিবর্তন হয়।

৩। **দিক নির্দেশনা ও পরিচালনা (Play) :** মূলত স্বল্প সময়ে কার্যসম্পাদনের জন্য কর্মীদেরকে দক্ষতা ও বিচক্ষনতার সাথে পরিচালনা করা। ব্যবস্থাপকদেরকে সীমিত সময়ের মধ্যে উদ্দেশ্যার্জনের জন্য কর্মীদেরকে দক্ষতার সাথে দিক নির্দেশনা প্রদান ও পরিচালনা করতে হবে।

৪। **অবস্থান (Position) :** অবস্থান বলতে দুই ধরনের অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। প্রথমত: প্রতিষ্ঠানের ভৌগলিক অবস্থান হতে হবে প্রতিযোগীর ভৌগোলিক অবস্থানের ভালো জায়গায়। দ্বিতীয়ত: বাজারে কোম্পানির অবস্থান কেমন? অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এটি বাজারে কতটুকু অংশ দখল করতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্যই প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি অংশ দখল করতে হবে।

৫। **ভালো মনোভাব (Perspective) :** এটি দ্বারা প্রতিষ্ঠানের সুদৃঢ়ভাবে বুঝানো হয়েছে। একটি বিখ্যাত কোম্পানির ভালো মনোভাব ও সুদৃঢ়তা থাকতে হয়। সুনাম, বাজারের আকার, ক্রেতা ও সমাজের প্রতি অঙ্গীকার প্রভৃতি হলো ভালো মনোভাব তথা Perspective এর উপাদান।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের জন্য এমন কৌশল বিবেচনা করতে হয়, যা কোম্পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের বিভিন্ন উপায় বা পন্থাসমূহ

Approaches to HRM Strategies

Richardson and Thompson মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের তিনটি উপায় বা পন্থার উন্নয়ন সাধন করেছেন যা অনুসরণ করা প্রতিষ্ঠানের জন্য মঙ্গলজনক। এগুলো নিম্নরূপ :

১। **সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা (Best Practice) :** এক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কিছু সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা রয়েছে যা গ্রহণ করা হলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উত্তম কার্যসম্পাদন করা সম্ভব হবে। তবে সকল ভালো চর্চাই সার্বিকভাবে ভালো চর্চা নাও হতে পারে। কারণ সেগুলো এক প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো কাজ করলেও অন্য প্রতিষ্ঠানের তা ভালো ফল নাও আনতে পারে। কারণ সেখানে এগুলো কৌশল, সংস্কৃতি, ব্যবস্থাপনা স্টাইল, প্রযুক্তি বা কার্যপন্থার জন্য তা ফল বয়ে সাথে উত্তমরূপে খাপ খায় না। প্রতিষ্ঠান ভেদে উত্তম চর্চা ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং "উত্তম চর্চা" (best practice) প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য চিন্তা ভাবনা করে গ্রহণ করা উচিত যেন যৌক্তিক ফলাফল অর্জন করা যায়।

২। **উত্তম উপযুক্ততা (Best Fit) :** এটি বিশ্বাস করা হয় যে, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিরন্তন কোনো পলিসি বা পন্থা নেই। তাই এ ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিস্থিতি, সংস্কৃতি প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিবেচনায় নিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাটিই অনুসরণ করতে হবে। এটিকে উত্তম উপযুক্ততা বা বেস্ট ফিট বলা হয়ে থাকে।

৩। **একত্রীকরণ বা গঠন পন্থা (Configurational or Building Approach) :** এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মানব সম্পদ ধারণার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে যেগুলো সমন্বয় করা হলে একে অপরের পরিপূরক ও সমর্থক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে।

কৌশল প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতাসমূহ

Limitations of Applying or Implementing Strategy

সম্ভাব্য প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপকগণ বহুবিধ কৌশল গ্রহণ করে থাকেন। সর্বক্ষেত্রে নির্ধারিত কৌশল ফলপ্রদ হয় না। কৌশলের প্রয়োগে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা রয়েছে বা যে সমস্ত কারণে কৌশল সফল হয় না নিম্নে এদের উল্লেখ করা হলো:

১। **গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির পরিবর্তন:** যে সমস্ত বিষয়ের ভিত্তিতে কৌশল প্রণয়ন করা হয় তাদের যে কোনো এক বা একাধিক বিষয়ের পরিবর্তন হলে কৌশল কার্যকর হয় না।

২। **প্রতিকূল পরিবেশগত অবস্থা:** অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করা না হলে কৌশল কার্যকর হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিবেচ্য কৌশল উপযুক্ত মনে হলেও তা কার্যকর নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক পরিবর্তন অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ অনুকূল না হলে পরিবর্তনের যে কোনো কৌশল কার্যকর করা যায় না।

৩। **প্রতি-আক্রমণাত্মক কৌশল:** প্রতিপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমপরিমাণ দক্ষ হলে কৌশল সফলকাম হয়না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য পণ্যমূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মূল্য পরিবর্তনের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল সফলকাম হয় না।

৪। **ভুল কৌশল নির্বাচন:** উপযুক্ত কৌশল বাছাই করা না হলে কৌশল কার্যকর হয় না। সঠিক সময়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রের জন্য যুৎসই কৌশল বাছাই-এর অভাবে কৌশলের দ্বারা সুফল হওয়ার পরিবর্তে কুফল হওয়ার আশংকা অধিক থাকে। যুৎসই কৌশল নির্বাচনের সমস্যা কৌশল প্রয়োগে অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়।

৫। **গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা:** অনেক সময় গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার কারণে কৌশলের সফল প্রয়োগ সম্ভব হয় না। কারণ প্রতিপক্ষ কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞাত হলে তারা প্রতি-আক্রমণাত্মক বা সাবধানতামূলক কৌশল গ্রহণ করে। ফলে কৌশলের বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৬। **অধিকতর ব্যবস্থাপনা নৈপুণ্যের অভাব:** প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান বা প্রতিকূল জটিল অবস্থা মোকাবিলায় ব্যবস্থাপককে অধিকতর নৈপুণ্যের অধিকারী হতে হয়। নিত্য নতুন অবস্থা মোকাবিলায় একজন ব্যবস্থাপকের উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োজন। তুলনামূলকভাবে তার ব্যবস্থাপনা নৈপুণ্য অধিক না হলে তার পক্ষে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের কৌশলের মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না।

৭। **সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রাক্কলনে ব্যর্থতা:** সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর যথাযথ প্রাক্কলনে ব্যর্থ হলে কৌশলের সফল প্রয়োগ হয় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ ঘটনার যথাযথ প্রাক্কলনের ব্যর্থতা কৌশলের প্রয়োগে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

৮। **কৌশলের সঠিক ব্যাখ্যার অভাব:** কোনো কোনো কৌশলের সঠিক ব্যাখ্যা দান করা সম্ভব হয় না। কৌশলের প্রয়োগ অনেকাংশে মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় তার সীমাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। একইভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৌশলের সঠিক ব্যাখ্যা দান করা সম্ভব না হলে কৌশলের কার্যকাতিা হ্রাস পায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতাসমূহ বিদ্যমান। এগুলো সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করতে না পারলে কৌশলের সুফল পাওয়া যায় না।

কৌশল সফল বাস্তবায়নে সুপারিশ

Recommendation for Effective Implementation of Strategy

সুষ্ঠুভাবে কৌশল বাস্তবায়নে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেছেন। এই ব্যাপারে হ্যারল্ড কুঞ্জ ও আইরিখ এর প্রদত্ত সুপারিশমালা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশের পরিস্থিতির আলোকে নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

১। **সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের অবহিতকরণ:** কৌশলের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শীর্ষ নির্বাহী কর্তৃক প্রণীত কৌশল সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের জানানো প্রয়োজন। কৌশল জানানোর সময় অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত যেন কৌশলসমূহ তাদের নিকট বোধগম্য হয়।

২। **পরিকল্পনা ভিত্তিসমূহের উন্নয়ন ও অবহিতকরণ:** কৌশল বাস্তবায়নে যে সমস্ত অনুমান বা পূর্বানুমান বিশেষ গুরুত্ব বহন করে তাদের সনাক্ত করা আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদেরকে বিভিন্ন পূর্বানুমান সম্বন্ধে অবহিত করা প্রয়োজন। তা না হলে কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুমান বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক প্রভাবিত হতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরনের অসমন্বিত রৈখিক পরিকল্পনার উদ্ভব হতে পারে।

৩। **বাস্তব পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য ও কৌশলের অভিব্যক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়:** বাস্তব পরিকল্পনা অবশ্যই উদ্দেশ্য ও কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়। কৌশলের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে পরিকল্পনাকে সহায়তা করা প্রয়োজন। বাস্তব পরিকল্পনা কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানপূর্বক কৌশল প্রণয়ন করা না হলে কৌশলের বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৪। **পরিস্থিতি-নির্ভর কৌশল ও কর্মসূচি প্রস্তুতকরণ:** প্রতিকূল অবস্থা বা প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের কৌশল মোকাবিলায় কৌশল প্রস্তুত করা হয়। প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতি নানাবিধ বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। পূর্বানুমানকৃত প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের আচরণ ও অনুমিত আচরণের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান দেখা দিতে পারে। সে জন্য কৌশল প্রস্তুত ও বাস্তবায়নকালে অনুমিত বিভিন্ন অবস্থা মোকাবিলায় বিকল্প কৌশল প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়।

অবস্থাভিত্তিক বিকল্প কৌশল প্রস্তুত করা না থাকলে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য অতি দ্রুত কৌশল বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়।

৫। **কৌশলসমূহের পর্যালোচনা:** অবস্থার পরিবর্তন সাপেক্ষে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রণীত কৌশলের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয়। তাই কৌশল বাস্তবায়নের সময় তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিয়মিত পর্যালোচনা করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণত এই জাতীয় পর্যালোচনা বৎসরে একবার বা একাধিকবার করা উচিত।

৬। **উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ:** অন্যান্য নীতির ন্যায় উপযুক্ত কাঠামো ছাড়া কৌশলের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। সেই জন্য কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। এতে ব্যবস্থাপক কী মাত্রায় কৌশল বাস্তবায়নে অবদান রাখবে সে সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝির আশংকা হ্রাস পায়।

৭। **সহায়ক সাংগঠনিক পরিবেশ প্রস্তুতকরণ:** বর্তমানে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় ভবিষ্যতে কৌশল বাস্তবায়নে ঐ সমস্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনো কোনো ব্যবস্থাপকের মধ্যে এই জাতীয় সমস্যা সমাধান না করার প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। সে জন্য এই জাতীয় প্রবণতা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কৌশল প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়।

৮। **পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ অব্যাহত রাখা:** কৌশল ও পরিকল্পনা বহুবিধ অংশ ও উপাংশের সমন্বয়ে গঠিত। সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক প্রতিটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ না করলে কৌশল ব্যর্থ হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এই প্রক্রিয়া বিরক্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও প্রতিটি অংশ ও উপাংশের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাত্রা অব্যাহত রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিতকরণের প্রক্রিয়া সচল থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, কৌশলের সফল বাস্তবায়নের জন্য উপরোক্ত সুপারিশগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক।

শিক্ষার্থীর কাজ :	কৌশল শুধু প্রণয়ন করলে হবে না, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে সুপারিশমালা খাতায় লিপিবদ্ধ করুন। কৌশলের কোন সীমাবদ্ধতা থাকলে তাও উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ:

কৌশলের '৫-পি' হলো- প্ল্যান বা পরিকল্পনা, পারপাস বা উদ্দেশ্য, প্লে বা দিক-নির্দেশনা, পজিশন বা অবস্থান এবং পারসপেকটিভ বা উত্তম মনোভাব। এ ৫-পি কৌশল প্রণয়নের সময় কাজে লাগে অর্থাৎ, তখন এগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। আবার মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের তিনটি উপায় রয়েছে, যেমন- সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা, সর্বোৎকৃষ্ট উপযুক্ততা ও একত্রীকরণ বা গঠন পন্থা। এগুলো কৌশল প্রণয়নের সময় বিশ্লেষণ করা হলে- প্রতিষ্ঠান উপকৃত ও সফল হবে।

সহায়ক গ্রন্থ:

- Michael Armstrong. Strategic Human Resource Management, A Guide to Action, 4th Edition, Kogan Roge Limited, 2008, USA.
- Jeffrey A. Mello, Strategic Human Resource Management, 4th Edition, Cengage Learning, USA, First Reprint in India-2019.

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. কৌশলের সংজ্ঞা দিন।
২. কৌশলের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৩. কৌশলের উপাদানসমূহ কী?
৪. কৌশলের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
৫. কৌশল কীভাবে গঠন করা যায়?
৬. কৌশল নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।
৭. কৌশলের ৫-পি সম্পর্কে আলোকপাত করুন। কৌশলের সীমাবদ্ধতা ও এর সফল বাস্তবায়নের সুপারিশ পেশ করুন।